

যুগান্তর

প্রিন্ট: ২৮ জুলাই ২০২৬, ১০:৪৫ এএম

শেষ পাতা

প্রাথমিক শিক্ষায় তদারকির ঘাটতি

রাজশাহীতে শিক্ষার্থী কমেছে ১ লাখ ৩৬
হাজার

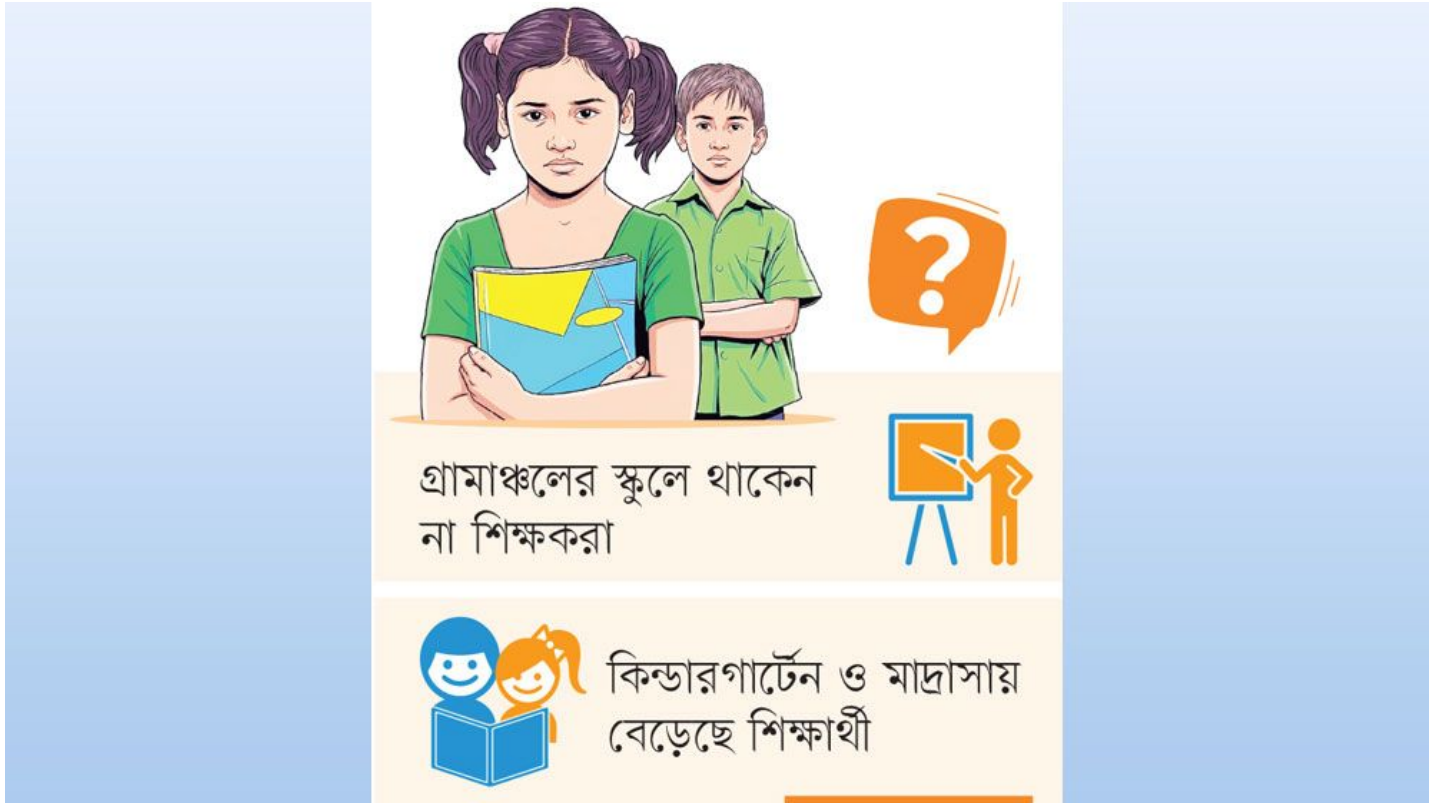
Advertisement



আনু মোস্তফা

প্রকাশ: ২৮ জুলাই ২০২৬, ১২:০০ এএম

প্রিন্ট সংস্করণ



শিক্ষকের সংখ্যা বেড়েছে। বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামো উন্নত হয়েছে। স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের বৃত্তিসহ আর্থিক প্রণোদনা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। সুযোগ-সুবিধা বাড়লেও রাজশাহী বিভাগের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় এক যুগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৯৮৩ জন। তবে শিক্ষার্থী বাড়ছে কিন্ডারগার্টেন ও মাদ্রাসাগুলোয়। শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষাবিদরা শিক্ষার্থী হ্রাসের এই প্রবণতাকে উদ্বেগজনক ও শিক্ষাবিমুখ বলে অভিহিত করেছেন।

এদিকে অভিভাবকরা বলছেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষা কার্যক্রম ও মানসম্মত পাঠদান তদারকিতে চরম গাফিলতির ঘটনা ঘটে চলেছে। চরাঞ্চলসহ দুর্গম এলাকাগুলোর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় নতুন শিক্ষকদের পদায়ন হলেও কিছুদিনের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষা কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে বদলি হয়ে চলে যান সুবিধামতো জায়গায়। এক স্কুলে পদায়ন থাকলেও প্রেষণ নিয়ে সুবিধামতো স্কুলে সংযুক্ত হয়ে চাকরি করছেন। কোথাও ৫ জন শিক্ষকের জায়গায় ৭ জন আছেন, আবার যেখানে ৫ জন থাকার কথা, সেখানে এক বা দুজনে সামলাচ্ছেন গোটা স্কুল। এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির জন্য উপজেলা ও থানা শিক্ষা কর্মকর্তা ছাড়াও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তারাও দায়ী বলে অভিভাবকরা তাদের অভিযোগে বলেছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, রাজশাহী বিভাগের আট জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮ হাজার ৬৬৮টি। বিভাগের জেলাগুলোর মোট জনসংখ্যা ২ কোটি ৩৫ লাখ ৩ হাজার ১১৯ জন। সূত্রমতে, ২০১৪ সালে বিভাগের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় ভর্তি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৩ লাখ ২০ হাজার ৯৭৫ জন। ১২ বছর পর ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে বিভাগের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার্থী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১ লাখ ৮৩ হাজার ৯৯২ জনে। এক যুগে এক বিভাগে প্রাথমিকে শিক্ষার্থী কমেছে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৯৮৩ জন। অথচ এ সময়ে বিভাগের জনসংখ্যা বেড়েছে ২৫ লাখের বেশি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে আরও জানা যায়, ১২ বছরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লক্ষাধিক শিক্ষার্থী কমলেও বিপরীতে প্রাইভেট, বেসরকারি ও শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় (কিন্ডারগার্টেন) শিক্ষার্থী বেড়েছে। সূত্রমতে, ২০১৪ সালে প্রাইভেট ও কিন্ডারগার্টেনসহ শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ভর্তি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪ লাখ ৩৬ হাজার ৯৬৬ জন। ১২ বছরে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫ লাখ ৪৪ হাজার ৩৩০ জন। একই সময়ে ইবতেদায়ি, কওমি ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় শিশু শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩ লাখ ৮৮ হাজার ৪৮৭ জন থেকে বেড়ে হয়েছে ৪ লাখ ২৬ হাজার ৩৪৯ জন। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী কমে অপ্রাতিষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়াকে শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গুণগত শিক্ষার মানের অবনতিকেই দায়ী করেছেন।

শিক্ষাবিদরা বলেন, প্রাথমিকে শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার বড় কারণ হলো পাঠাদান তদারকিতে গাফিলতি এবং দুর্গম অঞ্চলের স্কুলগুলোয় শিক্ষক না থাকা, শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের জবাবদিহির অভাব।

রাজশাহীর বাগমারার কান্তানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আফরোজা খাতুন বলেন, আমার স্কুলের নিকটবর্তী এলাকায় দুটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল আছে। অভিভাবকরা সেসব স্কুলেই দিচ্ছেন সন্তানদের। আমার স্কুলে গত বছর ১০০ জন শিক্ষার্থী ছিল। এবার কমে ৬০ জন হয়েছে। বাগমারার অধিকাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী কমেছে।

রাজশাহীর উপকণ্ঠ আটকোষি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচ বছর আগে নিয়মিত শিক্ষার্থী ছিল পাঁচ শতাধিক। এখন কমে তিনশতে দাঁড়িয়েছে। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নীলুফা আক্তার খানম বলেন, আমার স্কুলের এক কিলোমিটারের ভেতরে ১০টি প্রাইভেট শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান

গড়ে উঠেছে। রয়েছে কয়েকটি মাদ্রাসাও। অভিভাবকরা সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্তানদের পাঠাচ্ছেন। তানোরের কচুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিখিল রঞ্জন প্রামাণিক জানান, তার স্কুলে ভর্তির কিছুদিন পর ১৭ শিশু শিক্ষার্থীকে অভিভাবকরা ছাড়িয়ে নিয়ে পার্শ্ববর্তী মাদ্রাসায় ভর্তি করেছেন।

গোদাগাড়ীর চর আষাঢ়িয়াদহ ইউনিয়নের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, নতুন করে যখন শিক্ষক নিয়োগ হয়, তখন চরাঞ্চলের স্কুলগুলোয় তাদের অনেকেরই পদায়ন হয়। কিন্তু কয়েক মাস যেতে-না-যেতেই তারা শিক্ষা কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে বদলি নিয়ে শহরের কাছাকাছি কোনো স্কুলে চলে যান। অনেকেই আবার প্রেষণে পছন্দের কোনো স্কুলে সংযুক্তি নিয়ে নেন। ফলে চরের কোনো একটি স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। চরাঞ্চলের স্কুলগুলো সারা বছরই শিক্ষার্থীর অভাবে ফাঁকা পড়ে থাকে। এসব দেখার কেউ নেই। রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার কেশরহাট পৌর এলাকার কামারপাড়ার অভিভাবক সাকিবুর রহমান জানান, সরকারি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরা আসেন আর যান। পড়ালেখা করানোর যে আন্তরিক তাগিদ, সেটা তাদের মাঝে দেখা যায় না। অনেকেই দূর থেকে আসেন। নির্ধারিত সময়ের আগেই তারা স্কুল ত্যাগ করেন। শিক্ষকরা চলে গেলে শিক্ষার্থীরাও আর থাকে না। অন্যদিকে কিন্ডারগার্টেন বা মাদ্রাসাগুলোয় অনেক ভালো পড়ালেখা হয়। রাজশাহীর অভিভাবক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পড়ানো হয়। তবে স্কুলগুলোর শিক্ষার মান নিয়ে অধিকাংশ অভিভাবকই সন্তুষ্ট নন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক আক্তার বানুর মতে, অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের কিন্ডারগার্টেন বা এই জাতীয় বেসরকারি শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিচ্ছেন। কারণ, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার ওপর তাদের আস্থা কম। খোঁজ নিলে দেখা যাবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও নিজের সন্তানদের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন না।

প্রাথমিক শিক্ষার অবনতিশীল অবস্থার বিষয়ে মতামত জানতে চাইলে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক হাবিবুর রহমান বলেন, অতীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিবিড় ও মানসম্মত শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা ছিল, তা এখন আর নেই। এছাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানব্যবস্থা এখনো মান্ধাতা আমলেই পড়ে আছে। তদারকির ঘাটতি আছে। দু-

একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বাদ দিলে সামগ্রিক ব্যবস্থা বেশ নাজুক। সরকার শিক্ষকদের বেতন-ভাতা এবং প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো খাতে বিপুল ব্যয় করছে। কিন্তু তার আউটপুট কম। নীতিনির্ধারকদের উচিত মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করা, পাঠদান কার্যক্রমে তদারকি বাড়ানো এবং পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোর স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা।

বিষয়টি সম্পর্কে জানতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালকের দপ্তরে যোগাযোগ করা হলে জানানো হয়, মাত্র একদিন আগে উপপরিচালক আব্দুস সালাম যোগদান করেই ঢাকায় গেছেন। সহকারী পরিচালক নুর আখতার জান্নাতুল ফেরদৌস অফিসের বাইরে ছিলেন। তবে তার মোবাইল ফোন নম্বরে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি কল ধরেননি। রাজশাহী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা একেএম আনোয়ার হোসেন বলেন, সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলোয় শিক্ষক সংকট, সরকারি স্কুলের প্রতি অভিভাবকদের অনীহা ও আস্থাহীনতার কারণে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। এছাড়া কোভিড-১৯-এর প্রভাবে এক বছর স্কুলগুলো ভালোভাবে চলতে পারেনি। সেটাও শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার কারণ হতে পারে।